লিখছেন অরবিন্দ রায় ...

৪ জুলাই ২০২০

' অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক অধিকারিক '-টা তাঁর একটা নিয়মতান্ত্রিক পরিচয় । আসল পরিচয় তিনি চিন্তাকর্মী । মূলত লেখাপত্র এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত বিবিধ বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন । গত তিন বছরে স্থানীয় দৈনিক ও সামাজিক মাধ্যমে মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি বরাক ও বরাকের বাইরে বিভিন্ন মতের মানুষের কাছে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছেন । সহজ , সাবলীল ও উপভোগ্য ভাষায় বিভিন্ন জটিল বিষয়ের উপস্থাপনা তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম । বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী । বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সংস্থার সঙ্গে জড়িত । বেশ কিছু ফেসবুক হোয়াটসএপ গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ।

তিনি অরবিন্দ রায়।

ঈশানকথার এই তৃতীয় পক্ষ থেকে তাঁকে আমরা সঙ্গে পেয়েছি।

আজ থেকে প্রতি পক্ষে তাঁর বিশেষ কলাম

" লিখছেন অরবিন্দ রায় "

ঈশান কথার পাঠকের জন্য ।

ভারত - চীনের ঝামেলার সূত্রপাত আজকের নয় । ভারতে তিব্বতীদের আশ্রয় প্রদান এবং বহু আলোচিত সিল্ক রুট জনিত শীতল যুদ্ধ ছাড়াও আরেকটি সংবেদনশীল বিষয় ছিল বা রয়েছে । ১৯৪৮ সালে যখন মাও সে তুং-এর ‘পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না’ প্রতিষ্ঠিত হয় , সেই সময় থেকে ভারতকে নিয়ে তাদের তরফে নানা অসুবিধার উদয় হয় । মূলত যে সমস্যা বারবার সামনে আসে , তা হল ম্যাকমোহন লাইন (১৯১৪ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে) , যেটা কখনওই মানতে চায়নি চীন । ব্রিটিশদের তৈরি করা এই সীমান্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে করেছিল চীন । স্বাধীন ভারতের এই লাইন সংশোধন করা উচিত বলে বারবার দাবি করেছিল ।

(C) Ishan Kotha

চীন এবং ভারতের সীমারেখা যা নেপাল , সিকিম , অরুণাচল প্রদেশ এবং ভূটান দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত । এই সীমার দৈর্ঘ্য মায়ানমার থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত । এই সীমারেখায় কিছু অমীমাংসিত অঞ্চল রয়েছে -- পশ্চিমে আকসাই চীন , যা সুইজারল্যান্ড এর সমান এক অঞ্চল । এবং এখানে তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সদর রয়েছে (তিব্বত ১৯৬৫ সালে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করে) । পূর্বে ভূটান এবং মায়ানমার এবং মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ এর একাংশ । দুটি অঞ্চলই চীন ১৯৬২ সালে দখল করেছিল । অরুণাচল প্রদেশ এর পশ্চিম সিয়াং জেলার একাংশ মেচুকা উপত্যকা দখল করেছিল ।

ভারত - চীন সীমারেখার পশ্চিম অংশ নির্ধারিত হয় ১৮৩৪ সালে । সেই সময় শিখ মিসলে জম্মু এবং কাশ্মীর সহ উত্তর ভারতের অধিকাংশ শাসন করত । ১৮৪২ সালে শিখ মিসলে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে সেই সময়কার প্রচলিত সীমার পক্ষে । ১৮৪৬ সালে ব্রিটিশরা শিখদের পরাজিত করে লাদাখ দখল করে নেয় । ব্রিটিশরা চীনা কূটনীতিকদের সাথে আলোচনায় বসে সীমারেখা বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে । পাঙং জলাশয় এবং কারাকরাম ঘাটের সীমা সুনির্দিষ্ট হলেও আকসাই নিয়ে চীনের আপত্তি থেকে যায় । সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কর্মকর্তা ডব্লিউ এইচ জনসন 'জনসন' রেখা'র প্রস্তাব করেন , আকসাই- চীনকে কাশ্মীর অংশে দেখানোর জন্য । জনসন এই রেখার প্রস্তাব কাশ্মীরের মহারাজার সামনে পেশ করেন এবং বিনিময়ে মহারাজা মোট ১৮,০০০ বর্গকিলোমিটার দাবি করেন । জনসনের প্রস্তাবকে অশুদ্ধ আখ্যা দেয়া হয় । তার প্রস্তাবিত সীমারেখাকে " " (পেটেন্টলি এবসার্ড) অপবাদও দেয়া হয় এবং এই রেখায় ভারতের অনেকখানি উত্তর পর্যন্ত দাবি করা হয় । ১৮৯২ সালের মধ্যে চীন কারাকরাম ঘাঁটিতে সীমা নির্ধারক চিহ্ন স্থাপন করে ।

১৯৫০-এর পর থেকে ঘনিয়ে ওঠা আগ্রাসনের মেঘে যুদ্ধ যখন আসন্ন , ঠিক তার আগে তৎকালীন চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌএন লাই প্রস্তাব দেন , লাদাখ পেয়ে গেলে অরুণাচলের উপর থেকে অধিকার সরিয়ে নেবেন তারা । স্বাভাবিক ভাবেই নেহরু সে প্রস্তাব মানেননি । তখন দেশের সেনাখাতে খরচ অনেক কম । কৃষি-শিল্পে জোর । এই অবস্থায় সীমান্ত সমস্যা অনেকটাই আড়াল করলেন নেহরু । সাধারণ মানুষের সামনে আনলেন না সবটা । কিন্তু , ১৯৬১ সাল থেকে দেশে এই ইস্যুতে নেহরু-বিরোধিতার হাওয়া উঠল । অভিযোগ উঠল , সরকার ভীতু । নেহরু জবাব দিন পার্লামেন্টে । একটা সময় পরে চাপের মুখে পড়ে নেহরু বলে বসেন , “আমি ভারতীয় সেনাকে নির্দেশ দিয়েছি , চীনা সেনাদের ছুড়ে ফেলে দিতে।"

মূল সংকটের একদিকে আকসাই চীন , অন্যদিকে অরুণাচল । ভারতের অরুণাচলকে চীন নিজের বলে দাবি করে । আর চীন নিয়ন্ত্রিত আকসাই-চীনকে দাবি করে ভারত । এর পরেই শুরু হয় ১৯৬২-র যুদ্ধ । আধুনিক কোনও অস্ত্র ছিল না ভারতের । কার্যত গোহারা হেরে যেতে হয় । তবে একটাই ভাল ব্যাপার হয় , চীনের মুখোশ খুলে যায় । প্রায় মাসখানেক ধরে চলে সেই যুদ্ধ । শোনা যায় চীনের তরফে ছিল প্রায় ৮০,০০০ সৈন্য আর ভারতের ? মাত্রই ১০ থেকে ২০ হাজার !

আবার ভারতের সঙ্গে ঝামেলার আরেক প্রধান কারণ হল তিব্বত । কথাটা বলেছিলেন মাও নেপালের একটি প্রতিনিধি দলকে ১৯৬৪ সালে । ভারত কখনো ভাবেনি যে চীন কোনোদিন ভারতে হামলা করতে পারে । যার আক্ষেপ পরবর্তীতে নেহরু করেন । অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রাক্তন সচিব সুধীন্দ্র কুলকার্নি তাঁর প্রবন্ধ " "-এ বলেছেন , “ বিতর্কিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে ক্রমাগত সংঘর্ষ ২০২০ সাল অবধি চলত না । ১৯৬০ সালে চীন ইঙ্গিত দিয়েছিল সমাধানের অংশ হিসেবে তারা আকসাই-চীনকে বাদ দিয়ে জম্মু-কাশ্মীর সমেত ভারতের সার্বভৌমত্বের দাবি মেনে নিতে পারে । " কুলকার্নি লিখছেন , নেহরু নিজের আশঙ্কার কথা নিজেকে বলেছিলেন, ' যদি আমি ওদের আকসাই চীন দিয়ে দিই , তাহলে আমি আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারব না । '

চীনে পাঁচ আঙুলের যুদ্ধনীতি চালু করেছিলেন 'পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না'-র প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব বিখ্যাত বিপ্লবী কম্যুনিস্ট চেয়ারম্যান মাও সে তুং। সেন্ট্রাল তিব্বত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রেসিডেন্ট লোবসাং-এর ব্যাখ্যা হল , " চীন যখন তিব্বত দখল করেছিল তখন মাও সে তুং আর সমসাময়িক অন্য নেতারা মনে করতেন , তিব্বত হল হাতের তালু । যা দখল করতেই হত চীন । এরপর বাকি ৫টা আঙুল দখল করে অধিকারের পরিসীমা বাড়াতে হবে। এই ৫টি আঙুলের প্রথমটি হল লাদাখ। বাকি ৪টি হল নেপাল , ভূটান , সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশ !! "

২০১৭ সালে দোকালাম সংঘর্ষ মাও লাল চীনের সেই ফাইভ ফিঙ্গার স্ট্র্যাটেজির-ই অংশ । সীমানা বাড়াতে লাদাখের পর চীনের পাখির চোখ নেপাল , ভূটান , সিকিম এবং অরুণাচলপ্রদেশ। লোবসাং সঙ্গে বেশ দায়িত্ব নিয়ে জানিয়েছেন , চীনা সেনাবাহিনীর টিবেট মিলিটারি কমান্ড (টিএমসি) ভারত ও চীনের সীমান্ত 'অ্যাকচুয়াল লাইন অব কন্ট্রোল' বা প্রহরারত । বহুদিন ধরেই এই টিএমসিকে ভারত সীমান্তের কাছে মোতায়েন করে রেখেছে চীন।

লাদাখের প্যাংগং লেকের প্রান্ত বরাবর চীনা প্রহরা নতুন নয়। কিন্তু সমস্যা নতুন করে ওসকানি পায় ভারতে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বের এনডিএ ক্ষমতায় আসার পর। ভারতের উপর দিয়ে চীন যে সিল্ক রুটের প্রস্তাব দেয় , তাতে বাধা পেয়ে চীন ক্ষুব্ধ হয় । অন্যদিকে , নয়াদিল্লির 'লুক ইস্ট'(অ্যাক্ট ইস্ট) পলিসির কারণে জাপান , ভিয়েতনাম , তাইওয়ান , অস্ট্রেলিয়া – এই দেশগুলি ভারতের বন্ধু হয় । চীনের শত্রুদেশ বলেই পরিচিত তারা । ভারত বলে নয় , অন্য কোনও এশিয়ান দেশেরই আর্থসামাজিক উত্থান মেনে নিতে পারে না চীন। রাশিয়ারও যে বর্ডারটা এখন চীনের সঙ্গে আছে , সেটাও জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বলেই দাবি রয়েছে। শুধু তাই নয় , তাইওয়ান বা হংকংকেও মানতেই চায় না চীন। জাপান নিয়েও তার সমস্যা। ফলে আজ ভারতে চীনের সেনা ঢোকা নিয়ে এত গোলযোগ হলেও , সমস্যা একা ভারতের নয়।

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং যখন গত সপ্তাহে চীনা সেনাবাহিনীকে "সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকার" পরামর্শ দেন তাকে অধিকাংশ পর্যবেক্ষক ব্যাখ্যা করেছেন সীমান্তে নতুন করে শুরু হওয়া সঙ্কটে ভারতের প্রতি চীনের প্রচ্ছন্ন একটি হুমকি হিসাবে । চীন এখন বিশ্ব শাসনের অভিপ্রায় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে । চীনের নেতা সি জিন পিং এক নয়া নীতি হাজির করেছেন দেশটির সামনে । দেশটির ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ কংগ্রেসে নিজের এই পথের প্রতি সবার সমর্থন (কোন পদ্ধতিতে সে প্রশ্ন বা উত্তর তোলা থাক। অনুমানে ভরসা থাকুক) আদায় করে নিয়েছেন তিনি । চীন এখন সম্প্রসারণের দিকে তাকিয়ে আছে । ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তান , মায়ানমার , শ্রীলঙ্কা ও নেপালকে সঙ্গে নিয়ে ভারতকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে চীন । পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়েছে , শ্রীলঙ্কায় নৌসেনা মজুত করেছে । বাংলাদেশকেও সঙ্গে নিতে চাইছে । চীনের জন্য আবার ভারত মহাসাগরও খুব দরকারি বিষয়। কারণ , তেলের খনি অবধি তাদের পৌঁছতে হবে। ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলিকে তাই সঙ্গী করতে চাইছে চীন।

চীন এবং ভারতের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ নতুন কোনো বিষয় নয় , কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখন হঠাৎ করে এই করোনাভাইরাস প্যানডেমিকের ভেতর এই সঙ্কট শুরু হলো কেন ?

অনেক বিশ্লেষক লিখছেন , বিশ্বে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তারের চেষ্টা চীন বেশ কিছুদিন ধরে করে চলেছে , এবং করোনাভাইরাস প্যানডেমিকে সারা বিশ্ব যখন ব্যতিব্যস্ত , তখন বেইজিং এটাকে একটা লক্ষ্য হাসিলের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছে । তবে অনেক বিশ্লেষক আবার এও বলছেন , লাদাখ সীমান্তের গালোয়ান উপত্যকায় গত কয়েকবছর ধরে ভারত যেভাবে রাস্তাঘাট সহ অবকাঠামো তৈরি করছে তাতে চীন সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে , এবং ভারতের এই কর্মকাণ্ড তারা আর মেনে নিতে রাজি নয় । হংকং ভিত্তিক এশিয়া টাইমসে তার এক লেখায় সুইডিশ বিশ্লেষক বার্টিল লিনটার বলছেন , লাদাখে ভারতের সড়ক নির্মাণকে চীন একটি হুমকি হিসাবে দেখতে শুরু করেছে।

(C) Ishan Kotha

সাম্প্রতিক রাগের আরও একটা কারণ আছে। ভারত খানিকটা আমেরিকার দিকে ঝুঁকছে । মোদি-ট্রাম্পের বন্ধুত্ব বারবার সামনে এসেছে।এটায় সম্যক সমস্যা দেখছে চীন । তাই সব মিলিয়ে এইসব রাগ থেকেই নতুন করে ঝাঁপ দিয়েছে ভারতের উপর ।

সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের পাশাপাশিই চলতে থাকে চীন-ভারতের অর্থনৈতিক লেনদেন । যদিও ভারত শুধুই আমদানি করে চীন থেকে , এ দেশের জিনিস চীনে যায় না । ২০১৯ আর্থিক বছরে চিন ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের মূল্য ৮৮ বিলিয়ন ডলার । যার মধ্যে চীনের অনুকূলে রয়েছে ৫৩.৫ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক ঘাটতি । যা অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ঘাটতির মধ্যে সর্বোচ্চ ফারাক। ভারতের মোট রফতানির ৫ শতাংশ এবং আমদানির ১৪ শতাংশ নেয় চীন । আর চীনের মোট রফতানির মাত্র ৩ শতাংশ আমদানি করে ভারত । ভারত থেকে চীনের আমদানি এক শতাংশের কম । ফলে বাণিজ্য বন্ধ হলে ক্ষতি ভারতেরই বেশি হবে।

এমন একটা পরিস্থিতি , চিনের থেকে আসা জিনিস বন্ধ করা যাবে না , একইসঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হবে , বাণিজ্যিক আদানপ্রদান থাকা মানেই যে যুদ্ধের সম্ভাবনা মিলিয়ে গেল , তা নয় । জার্মানি ও রাশিয়া (১৯৪১) অথবা চিন এবং আমেরিকা এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ । বাণিজ্য বা অর্থনীতি দিয়ে যুদ্ধ আটকানো যায় না । এখনও তেমনটাই ঘটছে ।

সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের যে বক্তব্য , ' বদলা নিতে হবে , চিনকে মারতে হবে '- এটা আসলে শুনতে ভাল লাগলেও , বাস্তবিক সমাধান নয় । ' একটা মারলে পাঁচটা মারব ' পরিস্থিতি নেই । পঞ্চাশটা আমাদের মরতে পারে , সেটা মাথায় রাখতে হবে ।

চীন থেকে বছরে ৭৪০০ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করে খুচরো ব্যবসায়ীরা । খুচরো ব্যবসায়ীরা ভোগ্যপণ্য , ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য , প্রসাধন সামগ্রী , মোবাইল , খেলনা , টি ভি , ফ্রিজ - এধরনের পণ্য নিয়ে ব্যবসা করেন । কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বয়লার থেকে শুরু করে ওষুধ শিল্পের অধিকাংশ কাঁচা মাল , গাড়ি শিল্প , বা অন্যান্য ভারী শিল্পও চীন নির্ভর হয়ে পড়েছে বহুলাংশে আর সেই অবস্থার পরিবর্তন করতে চাওয়া বাস্তবিক অসম্ভব । বলছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা জয়তী ঘোষ ।যেমন ওষুধ শিল্পে , একটা দেশের ওপরে বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়া অনুচিত । ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত একটা কমিটি তার রিপোর্ট দিয়েছিল । সরকার তো কিছুই করে নি ! আগে দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলুক সরকার , দেশীয় শিল্পকে প্রোৎসাহন দিন - যেটা চীন করে থাকে । তারপরে চীন থেকে আমদানি বন্ধ করার কথা বলবেন , না হলে বিষয়টা হাস্যকর হয়ে যাবে ।

বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞায় আদতে চীনের চেয়ে বেশি ভুগবে ভারত । ভারতীয় গরিবরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে : দরিদ্র গ্রাহকরা এ জাতীয় বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন । কারণ তারা সবচেয়ে দাম-সংবেদনশীল । উদাহরণস্বরূপ , যদি চীনা এসি বাদ দিয়ে ব্যয়বহুল জাপানি এসি বা কম দামি ভারতীয় পণ্যে বাজার ভরা হলে ধনী ভারতীয়রাও এ নিষেধাজ্ঞায় বেঁচে থাকতে পারবে । বেশির ভাগ দরিদ্র বেশি দামে জাপানি বা ইউরোপীয় এসি কিনতে পারবে না । আবার কম দামে দেশীয় পণ্য কিনে তাদের ভুগতে হবে । চীন থেকে যা যা আমদানি করা হয় ভারতে সেইসব বন্ধ করে দিয়ে দেশীয়ভাবে সবকিছু উৎপাদন করা অসম্ভব বলে মন্তব্য করছিলেন অর্থনৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষক কুনাল বোস । চীনা পণ্য বয়কট করতে হলে চীনের যে বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে গাড়ি থেকে শুরু করে নানা শিল্পে , সেগুলোর কী হবে ? ওগুলো বন্ধ করতে গেলে তো ওইসব শিল্প বা পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যাবে । তখন তো কাজ হারাবেন ভারতীয়রাই । " আর খুব দ্রুত চীনের মত কম দামে আর উন্নত মানের পণ্য ভারতেই তৈরি করাও যাবে না । সেই প্রচেষ্টা যদি করতে হয় , তাহলে সরকারকে অতি সক্রিয় হয়ে এগিয়ে আসতে হবে বলেও মনে করছে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো ।

(C) Ishan Kotha

সীমান্তে ডি-এস্কক্যালেট করার চেষ্টা , আলোচনা চলছে তাই । এটাও আবার চীনের একটা চাল । আলোচনার মাঝে জমিতে ঢুকে পড়তে ওস্তাদ তারা । এছাড়া চীনের ভৌগোলিক সুবিধা অনেক বেশি । ওদের দিকটা বেশ উঁচু , পাহাড় থেকে নেমে এসে আক্রমণ করবে ওরা । আমাদের করতে হবে উঠে গিয়ে । মানচিত্র দেখলে আর একটা জিনিস চোখে পড়বে , সীমান্ত ঘেঁষে চীনের জনসংখ্যা খুব কম । ক্ষয়ক্ষতি কম হবে । কিন্তু চীন আক্রমণ করলে ভারতের সীমান্তের মানুষগুলি বড় বিপদে পড়বে। এছাড়া , ভারতের হিমালয়ে রাস্তা বানাতে গেলেই ধস নামছে , ফলে ভারতের যোগাযোগের অসুবিধা থেকে যাচ্ছে । এখানেও চীন এগিয়ে আছে । ফলে যুদ্ধ কোনও সমাধান নয় এই পরিস্থিতিতে । কিন্তু আমরা নিজেদের দেশের অংশের অধিকার অবশ্যই ছেড়েও দিতে পারব না । ফলে ঠেকিয়ে রাখতে হবে চীনকে । ভয়টা বজায় রাখতে হবে । ফলে কূটনৈতিক ভাবে চিনকে সুচিন্তিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ । আমাদের তরফে সীমান্তে এসক্যালেট না করাই বাঞ্ছনীয় । চীন করলে আমরা অবশ্যই ঠেকাব । তবে সাধারণ মানুষের উত্তেজনার কারণে সংবাদমাধ্যম প্রভাবিত হলে , তার প্রতিফলন সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ক্ষেত্রে পড়লে , তা এই মুহূর্তে দেশের জন্য মঙ্গল হবে না। লন্ডনের কিংস কলেজের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক হর্ষ পান্ত বলেছেন , " ভারতের পুরো চীনা নীতি এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে ছিল যে আমরা আমাদের সীমান্ত ইস্যু নিয়ে মাথা ঘামাব না । তবে এই অনুমান ভুল হয়েছে । যখন আপনার সীমানা উত্তপ্ত হবে , তখন আপনি চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারবেন না । "